কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৪
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ৬

সূরা আন নিসা (১-১০)

সূরা আন নিসা কুরআনের চতুর্থ সূরা, এর আয়াত সংখ্যা ১৭৬টি এবং এর রূকুর সংখ্যা ২৪টি। আন নিসা সূরাটি মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে।

নামকরণ

(النِّسَاءُ) নিসা শব্দের অর্থ নারীগণ, মহিলাগণ। এ সূরায় মহিলাদের সাথে বিবাহ বন্ধন, ওয়ারিশসহ তাদের সার্বিক অধিকার ও ইসলাম ধর্মে তাদের মর্যাদার কথা আলোচনা করা হয়েছে বিধায় অত্র সূরার নাম সূরা আন্ নিসা (বা নারীগণ) করা হয়েছে। এ সূরা সম্পূর্ণই মদীনায় অবতীর্ণ হয়।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটি কয়েকটি ভাষণের সমষ্টি। সম্ভবত তৃতীয় হিজরীর শেষের দিক থেকে নিয়ে চতুর্থ হিজরীর শেষের দিকে অথবা পঞ্চম হিজরীর প্রথম দিকের সময়-কালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে এর বিভিন্ন অংশ নাযিল হয়। যদিও নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না, কোন আয়াত থেকে কোন আয়াত পর্যন্ত একটি ভাষণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নাযিল হয়েছিল এবং তার নাযিলের সময়টা কি ছিল, তবুও কোন কোন বিধান ও ঘটনার দিকে কোথাও কোথাও এমন সব ইঙ্গিত করা হয়েছে যার সহায়তায় রেওয়ায়াত থেকে আমরা তাদের নাযিলের তারিখ জানতে পারি। তাই এগুলোর সাহায্যে আমরা এসব বিধান ও ইঙ্গিত সম্বলিত এ ভাষণগুলোর মোটামুটি একটা সীমা নির্দেশ করতে পারি। যেমন আমরা জানি উত্তরাধিকার বন্টন ও এতিমদের অধিকার সম্বলিত বিধানসমূহ ওহোদ যুদ্ধের পর নাযিল হয়। তখন সত্তর জন মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন। এ ঘটনাটির ফলে মদীনার ছোট জনবসতির বিভিন্ন গৃহে শহীদদের মীরাস কিভাবে বন্টন করা হবে এবং তারা যেসব এতিম ছেলেমেয়ে রেখে গেছেন তাদের স্বার্থ কিভাবে সংরক্ষণ করা হবে, এ প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। এরই ভিত্তিতে আমরা অনুমান করতে পারি, প্রথম চারটি রুকু, ও পঞ্চম রুকূর প্রথম তিনটি আয়াত এ সময় নাযিল হয়ে থাকবে।যাতুর রিকা'র যুদ্ধে ভয়ের নামায (যুদ্ধ চলা অবস্থায় নামায পড়া) পড়ার রেওয়ায়াত আমরা হাদীসে পাই। এ যুদ্ধটি চতুর্থ হিজরীতে সংঘটিত হয়। তাই এখানে অনুমান করা যেতে পারে, যে ভাষণে (১৫ রুকূ') এ নামাযের নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে সেটি এরই কাছাকাছি সময়ে নাযিল হয়ে থাকবে। চতুর্থ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে মদীনা থেকে বনী নযীরকে বহিষ্কার করা হয়। তাই যে ভাষণটিতে ইহুদীদেরকে এ মর্মে সর্বশেষ সর্তকবাণী শুনিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, আমি তোমাদের চেহারা বিকৃত করে পেছন দিকে ফিরিয়ে দেবার আগে ঈমান আনো, সেটি এর পূর্বে কোন নিকটতম সময়ে নাযিল হয়েছিল বলে শক্তিশালী অনুমান করা যেতে পারে।বনীল মুসতালিকের যুদ্ধের সময় পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুমের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। আর এ যুদ্ধটি পঞ্চম হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। তাই যে ভাষণটিতে (৭ম রুকূ') তায়াম্মুমের কথা উল্লেখিত হয়েছিল সেটি এ সময়ই নাযিল হয়েছিল মনে করতে হবে।

নাযিলের উপলক্ষ / প্রেক্ষাপট

এভাবে সামগ্রিক পর্যায়ে সূরাটি নাযিল হওয়ার সময়-কাল জানার পর আমাদের সেই যুগের ইতিহাসের ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়া উচিত। এর সাহায্যে সূরাটি আলোচ্য বিষয় অনুধাবন করা সহজসাধ্য হবে।নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে সে সময় যেসব কাজ ছিল সেগুলোকে তিনটি বড় বড় বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। এক, একটি নতুন ইসলামী সমাজ সংগঠনের বিকাশ সাধন। হিজরতের পরপরই মদীনা তাইয়েবা ও তার আশেপাশের এলাকায় এ সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতের পুরাতন পদ্ধতি নির্মূল করে নৈতিকতা, তামাদ্দুন, সমাজরীতি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থা নতুন নীতি-নিয়ম প্রচলনের কর্মতৎপরতা এগিয়ে চলছিল। দুই, আরবের মুশরিক সম্প্রদায়, ইহুদী গোত্রসমূহ ও মুনাফিকদের সংস্কার বিরোধী শক্তিগুলোর সাথে ইসলামের যে ঘোরতর সংঘাত চলে আসছিল তা জারী রাখা। তিন, এ বিরোধী শক্তিগুলোর সকল বাধা উপেক্ষা করে ইসলামের দাওয়াতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকা এবং এ জন্য আরও নতুন নতুন ক্ষেত্রে প্রবেশ করে সেখানে ইসলামকে বিজয়ীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করা। এ সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে যতগুলো ভাষণ অবতীর্ণ হয়, তা সবই এই তিনটি বিভাগের সাথে সম্পর্কিত।

আলোচ্য বিষয়

ইসলামের সামাজিক কাঠামো নির্মাণ এবং বাস্তবে এ সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম অবস্থায় যে সমস্ত নির্দেশ ও বিধানের প্রয়োজন ছিল সূরা বাকারায় সেগুলো প্রদান করা হয়েছিল। বর্তমানে এ সমাজ আগের চাইতে বেশী সম্প্রসারিত হয়েছে। কাজেই এখানে আরো নতুন নতুন বিধান ও নির্দেশের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এ প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য সূরা নিসার এ ভাষণগুলোতে মুসলমানরা কিভাবে ইসলামী পদ্ধতিতে তাদের সামাজিক জীবনধারার সংশোধন ও সংস্কার সাধন করতে পারে তা আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে পরিবার গঠনের নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। বিয়েকে বিধি-নিষেধের আওতাধীন করা হয়েছে। সমাজে নারী ও পুরুষের সম্পর্কের সীমা নির্দেশ করা হয়েছে। এতিমদের অধিকার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। মীরাস বন্টনের নিয়ম-কানুন নির্ধারিত হয়েছে। অর্থনৈতিক লেনদেন পরিশুদ্ধ করার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ঘরোয়া বিবাদ মিটাবার পদ্ধতি শিখানো হয়েছে। অপরাধ দণ্ডবিধির ভিত গড়ে তোলা হয়েছে। মদপানের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। তাহারাত ও পাক-পবিত্রতা অর্জনের বিধান দেয়া হয়েছে। আল্লাহ ও বান্দার সাথে সৎ ও সত্যনিষ্ঠ মানুষের কর্মধারা কেমন হতে পারে, তা মুসলমানদের জানানো হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে দলীল সংগঠন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিধান দেয়া হয়েছে। আহলি কিতাবদের নৈতিক, ধর্মীয় মনোভাব ও কর্মনীতি বিশ্লেষণ করে মুসলমানদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন পূর্ববর্তী উম্মতদের পদাংক অনুসরণ করে চলা থেকে বিরত থাকে। মুনাফিকদের কর্মনীতির সমালোচনা করে যথার্থ ও খাঁটি ঈমানদারীর এবং ঈমান ও নিফাকের পার্থক্য সূচক চেহারা পুরোপুরি উন্মুক্ত করে রেখে দেয়া হয়েছে। ইসলাম বিরোধী শক্তিদের সাথে যে সংঘাত চলছিল ওহোদ যুদ্ধের পর তা আরো নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি করছিল। ওহোদের পরাজয় আশপাশের মুশরিক গোত্রসমূহ, ইহুদী প্রতিবেশীবৃন্দ ও ঘরের শত্রু বিভীষণ তথা মুনাফিকদের সাহস অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। মুসলমানরা সবদিক থেকে বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিল। এ অবস্থায় মহান আল্লাহ একদিকে আবেগময় ভাষণের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে মোকাবিলায় উদ্বুদ্ধ করলেন এবং অন্যদিকে যুদ্ধাবস্থায় কাজ করার জন্য তাদেরকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন। মদীনায় মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানদার

লোকেরা সব ধরনের ভীতি ও আশংকার খবর ছড়িয়ে হতাশা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করছিল। এ ধরনের প্রত্যেকটি খবর দায়িত্বশীলদের কাছে পৌঁছিয়ে দেবার এবং কোন খবর সম্পর্কে পুরোপুরি অনুসন্ধান না করার আগে তা প্রচার করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করার নির্দেশ দেয়া হয়।মুসলমানদের বারবার যুদ্ধে ও নৈশ অভিযানে যেতে হতো। অধিকাংশ সময় তাদের এমন সব পথ অতিক্রম করতে হতো যেখানে পানির চিহ্নমাত্রও পাওয়া যেতো না। সে ক্ষেত্রে পানি না পাওয়া গেলে অযু ও গোসল দুয়ের জন্য তাদের তায়াম্মুম করার অনুমতি দেয়া হয়। এছাড়াও এ অবস্থায় সেখানে নামায সংক্ষেপে করারও অনুমতি দেয়া হয়। আর যেখানে বিপদ মাথার ওপর চেপে থাকে সেখানে সালাতুল খওফ (ভয়কালীন নামায) পড়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দেয়া হয়। আরবের বিভিন্ন এলাকায় যেসব মুসলমান কাফের গোত্রগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল এবং অনেক সময় যুদ্ধের কবলেও পড়ে যেতো, তাদের ব্যাপারটি ছিল মুসলমানদের জন্য অনেক বেশী পেরেশানির কারণ। এ ব্যাপারে একদিকে ইসলামী দলকে বিস্তারিত নির্দেশ দেয়া হয় এবং অন্যদিকে ঐ মুসলমানদেরকেও সবদিক থেকে হিজরত করে দারুল ইসলামে সমবেত হতে উদ্বুদ্ধ করা হয়।ইহুদীদের মধ্যে বিশেষ করে বনী নাযীরের মনোভাব ও কার্যধারা অত্যন্ত বিরোধমূলক ও ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। তারা সব রকমের চুক্তির খোলাখুলি বিরুদ্ধাচরণ করে ইসলামের শত্রুদের সাথে সহযোগিতা করতে থাকে এবং মদীনায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিছাতে থাকে। তাদের এসব কার্যকলাপের কঠোর সমালোচনা করা হয় এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাদেরকে সর্বশেষ সতর্কবাণী শুনিয়ে দেয়া হয় এবং এরপরই মদীনা থেকে তাদের বহিষ্কারের কাজটি সমাধা করা হয়।মুনাফিকদের বিভিন্ন দল বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে। কোন্ ধরনের মুনাফিকদের সাথে কোন্ ধরনের ব্যবহার করা হবে, এ সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মুসলমানদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাই এদের সবাইকে আলাদা আলাদা শ্রেণীতে বিভক্ত করে প্রত্যেক শ্রেণীর মুনাফিকদের সাথে কোন্ ধরনের ব্যবহার করতে হবে, তা বলে দেয়া হয়েছে। চুক্তিবদ্ধ নিরপেক্ষ গোত্রসমূহের সাথে মুসলমানদের কোন ধরনের ব্যবহার করতে হবে, তাও সুস্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। মুসলমানদের নিজেদের চরিত্রকে ত্রুটিমুক্ত করাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এ সংঘাত সংঘর্ষে এ ক্ষুদ্র দলটি একমাত্র নিজের উন্নত নৈতিক চরিত্র বলেই জয়লাভ করতে সক্ষম ছিল। এছাড়া তার জন্য জয়লাভের আর কোন উপায় ছিল না। তাই মুসলমানদেরকে উন্নত নৈতিক চরিত্রের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তাদের দলের মধ্যে যে কোন দুর্বলতা দেখা দিয়েছে কঠোর ভাষায় তার সমালোচনা করা হয়েছে। ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারের দিকটিও এ সূরায় বাদ যায়নি। জাহেলিয়াতের মোকাবিলায় ইসলাম দুনিয়াকে যে নৈতিক ও তামাদ্দুনিক সংশোধনের দিকে আহবান জানিয়ে আসছিল, তাকে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করার সাথে সাথে এ সূরায় ইহুদী, খৃস্টান ও মুশরিক এ তিনটি সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত ধর্মীয় ধারণা-বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র নীতি ও কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে তাদের সামনে একমাত্র সত্য দ্বীন ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হয়েছে।

পূর্বের ও পরের সূরার সাথে সম্পর্ক

সূরা আলে ইমরানের সর্বশেষ আয়াতটি ছিল তাকওয়া সম্পর্কিত। আর আলোচ্য সূরা 'নিসা'ও শুরু হয়েছে তাকওয়ারই বৈশিষ্ট্য বর্ণনার মাধ্যমে। প্রথমোক্ত সূরায় বিভিন্ন যুদ্ধ-জিহাদ, শত্রুপক্ষের সাথে আচার-আচরণ, যুদ্ধলব্ধ বস্তুসামগ্রীর (গনীমতের মাল) অপচয় ও আত্মসাতের ভয়াবহ পরিণাম প্রভৃতি বর্ণনা করা হয়েছে। আর

আলোচ্য সূরার শুরুতে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং অন্যের অধিকার সংক্রান্ত বিধান জারি করা হয়েছে। যেমন– অনাথ-ইয়াতীমের অধিকার, আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ও স্ত্রীদের অধিকার প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে।

সূরা মায়েদাতেও সূরা নিসার মত মাসআলা-মাসায়েল, লেনদেন, পারস্পরিক চুক্তি অঙ্গীকার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। এ কারণেই রূহুল মাআনীর গ্রন্থকার বলেনঃ বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান অভিন্ন। কেননা, এ দুটি সূরায় প্রধানত মৌলিক বিবি-বিধান ও আকায়েদ যথা-তওহীদ, রিসালত, কিয়ামত ইত্যাদির বর্ণনা উল্লিখিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ও বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে সূরা নিসা ও সূরা মায়েদা বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে অভিন্ন। কেননা, এ দুটি সূরায় প্রধানত বিভিন্ন বিধি-বিধানের বিস্তারিত আলোচনা স্থান লাভ করেছে এবং মৌলিক বিধি-বিধান প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হয়েছে। সূরা নিসায় পারস্পরিক লেনদেন ও বান্দার হকের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর হক, ইয়াতীমের হক, পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য অধিকারের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। সূরা মায়েদার প্রথম আয়াতেও এসব লেন-দেন ও চুক্তি-অঙ্গীকার মেনে চলা ও পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ফযীলত

আবূ বকর ইবনু আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহঃ) ... আবদুল্লাহ (ইবনু মাসউদ) (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, আমাকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাও। আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনাকে আমি পড়ে শোনাব, অথচ আপনার উপরেই তো তা নাযিল হয়েছে। তিনি বললেন, অন্য কারো নিকট থেকে শুনতে আমার ভাল লাগে। তখন আমি সূরা নিসা পাঠ করলাম যখন فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاَءِ شَهِيدًا “যখন প্রত্যেক উম্মাত হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করবে এবং তোমাকে ওদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য উপস্থিত করব তখন অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে? (নিসাঃ ৪১) এ আয়াত পৌঁছলাম, আমি মাথা তুললাম কিংবা আমার পাশের এক ব্যাক্তি আমাকে হাত দিয়ে চাপ দিলে আমি আমার মাথা তুললাম। দেখলাম, তাঁর অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। (মুসলিম ১৭৪০)

আবদুল্লাহ ইবনু রাজা (রহঃ) ... বারা (ইবনু আযির) (রাঃ) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, সর্বশেষে যে সূরাটি পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় অবতীর্ন হয়েছিলো, তা ছিল সূরা বারাআত। আর সর্বশেষ যে সূরার আয়াতটি সমাপ্তি রুপে অবতীর্ন হয়েছিল সেটি ছিল সূরা নিসার এ আয়াতঃ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ অর্থাৎ ’লোকেরা আপনার কাছে সমাধান জানতে চায়, বলুন, পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যাক্তি সম্বন্ধে তোমাদিগকে আল্লাহ্ তায়া’লা সমাধান জানোাচ্ছেন, (কোন পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক বোন থাকে তাহলে বোনের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ হবে) (সূরা নিসা ১৭৬)। (বুখারী ৪০২৫)

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “যে ব্যক্তি সূরা আলে ইমরান পড়বে সে অমুখাপেক্ষী হবে, আর সূরা আন-নিসা হচ্ছে সৌন্দর্যপূর্ণ।” (সুনান দারেমী ৩৩৯৫)

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: সূরা নিসায় পাঁচটি আয়াত রয়েছে, যদি আমি সারা দুনিয়া পেতাম তাহলে তত খুশি হতাম না যত খুশি হয়েছি এ আয়াতগুলো পেয়ে।আয়াত পাঁচটি হল: ১. “আল্লাহ অণু পরিমাণও জুলুম করেন না।” (সূরা নিসা ৪:৪০) ২. “তোমাদেরকে যে সকল কবীরা গুনাহ থেকে নিষেধ করা

হয়েছে তা হতে বিরত থাকলে ... ” (সূরা নিসা ৪:৩১) ৩. “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরীক করা ক্ষমা করেন না। এটা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।” (সূরা নিসা ৪:৪৮) ৪. “যখন তারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল তখন যদি তারা তোমার নিকট আসত।” (সূরা নিসা ৪:৬৪) ৫. “যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ করে অথবা নিজের প্রতি জুলুম পরে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে।” (সূরা নিসা ৪:১১০)। (হাকিম ২/৩০৫, মুরসাল সহীহ)

তাফসীর

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

১. হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন; আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে নিজ নিজ হক দাবী কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারেও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন কর - সূরার শুরুতে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং অন্যের অধিকার সংক্রান্ত বিধান জারি করা হয়েছে। যেমন- অনাথ ইয়াতীমের অধিকার, আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ও স্ত্রীদের অধিকার প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, হক্কুল-ইবাদ বা অন্যের অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট এমন কতকগুলো অধিকার রয়েছে, যেগুলো সাধারণতঃ দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় পড়ে এবং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তা কার্যকর করা যেতে পারে। সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া ও শ্রমের মজুরী প্রভৃতি এ জাতীয় অধিকার যা মূলতঃ দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে কার্যকর হয়ে থাকে। এসব অধিকার যদি কোন এক পক্ষ আদায় করতে ব্যর্থ হয় অথবা সেক্ষেত্রে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়, তাহলে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তার সুরাহা করা যেতে পারে। কিন্তু সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, কারো নিজ বংশের ইয়াতীম ছেলে-মেয়ে এবং আত্মীয়-স্বজনের পারস্পরিক অধিকার আদায় হওয়া নির্ভর করে সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও আন্তরিকতার উপর। এসব অধিকার তুলাদণ্ডে পরিমাপ করা যায় না। কোন চুক্তির মাধ্যমেও তা নির্ধারণ করা দুষ্কর। সুতরাং এসব অধিকার আদায়ের জন্য আল্লাহ-ভীতি এবং আখেরাতের ভয় ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন উত্তম উপায় নেই। আর একেই বলা হয়েছে তাকওয়া।

বস্তুতঃ এই তাকওয়া দেশের প্রচলিত আইন ও প্রশাসনিক শক্তির চেয়ে অনেক বড়। তাই আলোচ্য সূরাটিও তাকওয়ার বিধান দিয়ে শুরু হয়েছে। সম্ভবতঃ এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ের খোতবায় এ আয়াতটি পাঠ করতেন। বিয়ের খোতবায় এ আয়াতটি পাঠ করা সুন্নাত। তাকওয়ার হুকুমের সাথে সাথে আল্লাহর অসংখ্য নামের মধ্যে এখানে ‘রব’ শব্দটি ব্যবহার করার মধ্যেও একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। অর্থাৎ

এমন এক সত্তার বিরুদ্ধাচারণ করা কি করে সম্ভব হতে পারে, যিনি সমগ্র সৃষ্টিলোকের লালন-পালনের যিম্মাদার এবং যার রুবুবিয়্যাত বা পালন-নীতির দৃষ্টান্ত সৃষ্টির প্রতিটি স্তরে স্তরে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত।

এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন - 'একটি ব্যক্তি/প্রাণ' বলতে মানবকুলের পিতা আদম (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। আর خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا এতে مِنْهَاথেকে উক্ত প্রাণ অর্থাৎ, আদম (আঃ)-কেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আদম (আঃ) থেকেই তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করেন। আদম (আঃ) থেকে হাওয়াকে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, হাওয়া পুরুষ অর্থাৎ, আদম (আঃ) থেকে সৃষ্টি হয়েছেন। অর্থাৎ, তাঁর পাঁজরের হাড় থেকে। অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, "নারীদেরকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়ের মধ্যে উপরের হাড়টি অধিক বাঁকা। যদি তা সোজা করতে যাও, তাহলে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি তুমি তার দ্বারা উপকৃত হতে চাও, তবে তার মধ্যে বক্রতা অবশিষ্ট থাকা অবস্থাতেই উপকৃত হতে পারবে।" (বুখারী ৩৩৩১, মুসলিম ১৪৬৮নং)

তাকওয়া অবলম্বন কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারেও- আলোচ্য আয়াতের দুটি অর্থ হতে পারে। একটি যা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্কের ব্যাপারে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। সুতরাং তোমরা আতীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখ। এ অর্থটি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে। [তাবারী] আয়াতের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তোমরা যে আল্লাহ ও আত্মীয়তার সম্পর্কের খাতিরে পরস্পর কোন কিছু চেয়ে থাক। অর্থাৎ তোমরা সাধারণত বলে থাক যে, আমি আল্লাহর ওয়াস্তে এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের খাতিরে কোন কিছু তোমার কাছে চাই। সুতরাং দু কারণেই তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। এ অর্থটি মুজাহিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ] পবিত্র কুরআনের আত্মীয়তার সম্পর্ক বুঝানোর জন্য 'আরহাম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা মূলতঃ একটি বহুবচনবোধক শব্দ। এর একবচন হচ্ছে রাহেম। যার অর্থ জরায়ু বা গর্ভাশয়। অর্থাৎ জন্মের প্রাক্কালে মায়ের উদরে যে স্থানে সন্তান অবস্থান করে। জন্মসূত্রেই মূলতঃ মানুষ পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বুনিয়াদকে ইসলামী পরিভাষায় 'সেলায়ে-রাহমী' বলা হয়। আর এতে কোন রকম বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হলে তাকে বলা হয় 'কেত্বয়ে-রাহমী'। হাদীসে আত্মীয়তার সম্পর্কের উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার রিযিকের প্রাচুর্য এবং দীর্ঘ জীবনের প্রত্যাশা করে, তার উচিত আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। [বুখারীঃ ২০৬৭; মুসলিমঃ ২৫৫৭]

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের প্রায় সাথে সাথেই আমিও তার দরবারে গিয়ে হাজির হলাম। সর্বপ্রথম আমার কানে তার যে কথাটি প্রবেশ করল, তা হল এইঃ হে লোক সকল! তোমরা পরস্পর পরস্পরকে বেশী বেশী সালাম দাও। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য মানুষকে খাদ্য দান কর। আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোল এবং রাতের বেলায় সালাতে মনোনিবেশ কর, যখন সাধারণ লোকেরা নিদ্রামগ্ন থাকে। স্মরণ রেখো, এ কথাগুলো পালন করলে তোমরা পরম সুখ ও শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। [মুসনাদে আহমাদ: ৫৪৫১ ইবন মাজাহ ৩২৫১] অন্য হাদীসে এসেছে, উম্মুল-মুমিনীন মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার এক বাদিকে মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যখন এ খবর পৌছালেন, তখন তিনি বললেন, তুমি যদি বাদিটি তোমার মামাকে দিয়ে দিতে, তাহলে অধিক পূণ্য লাভ করতে পারতে। [বুখারীঃ ২৫৯৪] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেনঃ কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করলে সদকার সওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু কোন নিকট

আত্মীয়কে সাহায্য করলে একই সঙ্গে সদকা এবং আত্মীয়তার হক আদায়ের দ্বৈত পূণ্য লাভ করা যায় । [বুখারীঃ ১৪৬৬, মুসলিমঃ ১০০০]

আয়াতের শেষে মানুষের অন্তরকে আত্মীয়-স্বজনের অধিকার আদায়ের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে আল্লাহ বলেন, আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে খুবই সচেতন ও পর্যবেক্ষণকারী। আল্লাহ তোমাদের অন্তরের ইচ্ছার কথাও ভালভাবে অবগত রয়েছেন। কিন্তু যদি লোক লজ্জার ভয়ে অথবা সমাজ ও পরিবেশের চাপে পড়ে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সুব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহর কাছে এর কোন মূল্য নেই।

وَ اٰتُوا الۡیَتٰمٰۤی اَمۡوَالَہُمۡ وَ لَا تَتَبَدَّلُوا الۡخَبِیۡثَ بِالطَّیِّبِ ۪ وَ لَا تَاۡکُلُوۡۤا اَمۡوَالَہُمۡ اِلٰۤی اَمۡوَالِکُمۡ ؕ اِنَّہٗ کَانَ حُوۡبًا کَبِیۡرًا

২. আর ইয়াতীমদেরকে তোমরা তাদের ধন-সম্পদ সমর্পণ করো এবং ভালোর সাথে মন্দ বদল করো না আর তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদ মিশিয়ে গ্রাস করো না; নিশ্চয় এটা মহাপাপ।

ইয়াতীমদেরকে তোমরা তাদের ধন-সম্পদ সমর্পণ করো- আয়াতে বলা হয়েছে, ইয়াতীমের সম্পদ তাদেরকে যথার্থভাবে বুঝিয়ে দাও। আরবী 'ইয়াতীম' শব্দটির অর্থ হচ্ছে- নিঃসঙ্গ। একটি ঝিনুকের মধ্যে যদি একটিমাত্র মুক্তা জন্ম নেয়, তখন একে 'দুররাতুন-ইয়াতীমাতুন' বা 'নিঃসঙ্গ মুক্তা' বলা হয়ে থাকে। ইসলামী পরিভাষায় যে শিশু-সন্তানের পিতা ইন্তেকাল করে, তাকে ইয়াতীম বলা হয়। ছেলে-মেয়ে বালেগ হয়ে গেলে তাদেরকে ইসলামী পরিভাষায় ইয়াতীম বলা হয় না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বালেগ হওয়ার পর আর কেউ ইয়াতীম থাকে না। [আবু দাউদঃ ২৮৭৩]

ইয়াতীম যদি পারিতোষিক অথবা উপঢৌকন হিসেবে কিছু সম্পদপ্রাপ্ত হয়, তাহলে ইয়াতীমের অভিভাবকের দায়িত্ব হচ্ছে সেসব মালেরও হেফাজত করা। ইয়াতীমের মৃত পিতা অথবা দেশের সরকার যে-ই উক্ত অভিভাবককে মনোনীত করুক না কেন; তার উপরই ইয়াতীমের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বর্তায়। উক্ত অভিভাবকের উচিত, ইয়াতীমের যাবতীয় প্রয়োজন তার গচ্ছিত ধন-সম্পদ থেকে নির্বাহ করা। এ আয়াতে ইয়াতিমের সম্পদ তার হাতে বুঝিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কোন শর্তারোপ করা হয়নি। পক্ষান্তরে পরবর্তী ৬ নং আয়াতে এ সম্পদ তাদের কাছে প্রত্যার্পণ করার জন্য দুটি শর্ত দিয়েছে। এক, ইয়াতীম বালেগ হতে হবে, দুই ভাল-মন্দ বিবেচনা করার ক্ষমতা থাকতে হবে। কারণ, বালেগ হওয়ার পূর্বে তার জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেচনা সম্পত্তি সংরক্ষণের মত না হওয়াই স্বাভাবিক। দুটো বিষয় তাদের মধ্যে পাওয়া গেলে তাদের সম্পদ তাদের কাছে ফেরৎ দেয়া উচিত। [আদওয়াউল বায়ান]

وَ لَا تَتَبَدَّلُوا الۡخَبِیۡثَ بِالطَّیِّبِ - 'খাবীস' বলতে নিকৃষ্ট জিনিস এবং 'ত্বাইয়্যিব' বলতে উৎকৃষ্ট জিনিসকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, এমন করো না যে, তাদের মাল থেকে উৎকৃষ্ট জিনিসগুলো নিয়ে তার পরিবর্তে নিকৃষ্ট জিনিস দিয়ে গুনতি পূরণ করে দেবে। এই নিকৃষ্ট জিনিসগুলোকে খাবীস (নাপাক) এবং উৎকৃষ্ট জিনিসগুলোকে ত্বাইয়্যিব (পবিত্র) আখ্যা দিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এইভাবে পরিবর্তন করা মাল যদিও প্রকৃতপক্ষে ত্বাইয়্যিব (পবিত্র ও হালাল), তবুও তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতা তাকে অপবিত্র করে দিয়েছে। কাজেই এখন তা আর পবিত্র

নেই, বরং তোমাদের জন্য তা অপবিত্র ও হারাম হয়ে গেছে। অনুরূপ বেঈমানী করে তাদের মালকে নিজের মালের সাথে মিশ্রিত করে খাওয়াও নিষেধ। [তাফসীরে আহসানুল বায়ান]

এ আয়াতে ইয়াতিমের সম্পদ গ্রাস করাকে বড় গুনাহ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু গোনাহের পরিণাম সম্পর্কে এখানে কিছু বলা হয়নি। এ সূরারই ১০ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সেটা ঘোষণা করে বলেছেন, "যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তো তাদের পেটে আগুনই খাচ্ছে, তারা অচিরেই জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে।"

وَ اِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا تُقۡسِطُوۡا فِی الۡیَتٰمٰی فَانۡکِحُوۡا مَا طَابَ لَکُمۡ مِّنَ النِّسَآءِ مَثۡنٰی وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ ۚ فَاِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا تَعۡدِلُوۡا فَوَاحِدَۃً اَوۡ مَا مَلَکَتۡ اَیۡمَانُکُمۡ ؕ ذٰلِکَ اَدۡنٰۤی اَلَّا تَعُوۡلُوۡا

৩. আর যদি তোমরা আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে, দুই, তিন বা চার আর যদি আশংকা কর যে সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকেই বা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকেই গ্রহণ কর। এতে পক্ষপাতিত্ব না করার সম্ভাবনা বেশী।

এ আয়াতে ইয়াতীম মেয়েদের বৈবাহিক জীবনের যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সাধারণ আইন-কানুনের মত তা শুধু প্রশাসনের উপর ন্যস্ত করার পরিবর্তে জনসাধারণের মধ্যে আল্লাহ-ভীতির অনুভূতি জাগ্রত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যদি ইনসাফ করতে পারবে না বলে মনে কর, তাহলে ইয়াতীম মেয়েদেরকে বিয়ে করবে না; বরং সে ক্ষেত্রে অন্য মেয়েদেরকেই বিয়ে করে নেবে। এ কথা বলার সাথে সাথে সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের দায়িত্বের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। যাতে ইয়াতীম ছেলে-মেয়েদের কোন প্রকার অধিকার ক্ষুন্ন না হয় সে ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন থাকার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

জাহেলিয়াত যুগে ইয়াতীম মেয়েদের অধিকার চরমভাবে ক্ষুন্ন করা হত। যদি কোন অভিভাবকের অধিনে কোন ইয়াতীম মেয়ে থাকত আর তারা যদি সুন্দর হত এবং তাদের কিছু সম্পদ-সম্পত্তিও থাকত, তাহলে তাদের অভিভাবকরা নামমাত্র মাহর দিয়ে তাদেরকে বিয়ে করে নিত অথবা তাদের সন্তানদের সাথে বিয়ে দিয়ে সম্পত্তি আত্মসাৎ করার চক্রান্ত করত। এসব অসহায় মেয়েদের পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থার কথা তারা চিন্তাও করত না। আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ঠিক এ ধরণের একটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। জনৈক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে একটি ইয়াতীম মেয়ে ছিল। সে ব্যক্তির একটি বাগান ছিল, যার মধ্যে উক্ত ইয়াতীম বালিকাটিরও অংশ ছিল। সে ব্যক্তি উক্ত মেয়েটিকে বিয়ে করে নিল এবং নিজের পক্ষ থেকে দেন-মাহর আদায় তো করলই না, বরং বাগানে মেয়েটির যে অংশ ছিল তাও সে আত্মসাৎ করে নিল। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। [বুখারীঃ ৪৫৭৩]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তখনকার দিনে কারও কাছে কোন ইয়াতীম থাকলে এবং তার সম্পদ ও সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করলে সে তাকে বিয়ে করতে চাইত। তবে তাকে অন্যদের সমান মাহর দিতে চাইত না। তাই তাদের মাহর পূর্ণ ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের না দিয়ে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাদের ব্যাপারে কোন প্রকার ত্রুটি করার ইচ্ছা থাকলে তাদের বাদ দিয়ে অন্যান্য মহিলাদের বিয়ে করতে নির্দেশ দেয়া

হয়েছে। [বুখারী ৪৫৭৪] তবে এর অর্থ এই নয় যে, অন্যান্য নারীদের বেলায় ইনসাফ বিধান করা লাগবে না। বরং অন্যান্য নারীদের বেলায়ও তা করতে হবে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

বহু-বিবাহ প্রথাটি ইসলামপূর্ব যুগেও দুনিয়ার প্রায় সকল ধর্মমতেই বৈধ বলে বিবেচিত হত। আরব, ভারতীয় উপমহাদেশ, ইরান, মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশেই এই প্রথার প্রচলন ছিল। বহু-বিবাহের প্রয়োজনীয়তার কথা বর্তমান যুগেও স্বীকৃত। বর্তমান যুগে ইউরোপের এক শ্রেণীর চিন্তাবিদ বহু-বিবাহ রহিত করার জন্য তাদের অনুসারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করে আসছেন বটে, কিন্তু তাতে কোন সুফল হয়নি। বরং তাতে সমস্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর ফল রক্ষিতার রূপে প্রকাশ পেয়েছে। অবশেষে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক ব্যবস্থারই বিজয় হয়েছে। তাই আজকে ইউরোপের দূরদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বহু-বিবাহ পুনঃপ্রচলন করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করছেন। ইসলাম একই সময়ে চারের অধিক স্ত্রী রাখাকে হারাম ঘোষণা করেছে। ইসলাম এ ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েমের জন্য বিশেষ তাকিদ দিয়েছে এবং ইনসাফের পরিবর্তে যুলুম করা হলে তার জন্য শাস্তির কথা ঘোষণা করেছে।

আলোচ্য আয়াতে একাধিক অর্থাৎ চারজন স্ত্রী গ্রহণ করার সুযোগ অবশ্য দেয়া হয়েছে, অন্যদিকে এই চার পর্যন্ত কথাটি আরোপ করে তার উর্ধ্ব সংখ্যক কোন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে না বরং তা হবে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ- তাও ব্যক্ত করে দিয়েছে। ইসলাম পূর্ব যুগে কারও কারও দশটি পর্যন্ত স্ত্রী থাকত। ইসলাম এটাকে চারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। কায়েস ইবন হারেস বলেন, 'আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি তখন আমার স্ত্রী সংখ্যা ছিল আট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আসলে তিনি আমাকে বললেন, 'এর মধ্য থেকে চারটি গ্রহণ করে নাও। [ইবন মাজাহ: ১৯৫২, ১৯৫৩]

পবিত্র কুরআনে চারজন স্ত্রীর কথা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং সাথে সাথে এও বলে দেয়া হয়েছে যে, যদি তোমরা তাদের মধ্যে সমতা বিধান তথা ন্যায় বিচার করতে না পার, তাহলে এক স্ত্রীর উপরই নির্ভর কর। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, একাধিক বিয়ে ঠিক তখনই বৈধ হতে পারে, যখন শরীআত মোতাবেক সবার সাথে সমান আচরণ করা হবে; তাদের সবার অধিকার সমভাবে সংরক্ষণ করা হবে। এ ব্যাপারে অপারগ হলে এক স্ত্রীর উপরই নির্ভর করতে হবে এবং এটাই ইসলামের নির্দেশ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক স্ত্রীর বেলায় সবার সাথে পরিপূর্ণ সমতার ব্যবহার করার ব্যাপারে বিশেষ তাকিদ দিয়েছেন এবং যারা এর খেলাফ করবে, তাদের জন্য কঠিন শাস্তির খবর দিয়েছেন। নিজের ব্যবহারিক জীবনেও তিনি এ ব্যাপারে সর্বোত্তম আদর্শ স্থাপন করে দেখিয়েছেন। এমনকি তিনি এমন বিষয়েও সমতাপূর্ণ আদর্শ স্থাপন করেছেন যে ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন ছিল না। এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তির দুই স্ত্রী রয়েছে, সে যদি এদের মধ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্ণ সমতা ও ইনসাফ করতে না পারে, তবে কিয়ামতের ময়দানে সে এমনভাবে উঠবে যে, তার শরীরের এক পার্শ্ব অবশ হয়ে থাকবে। [আবু দাউদঃ ২১৩৩, তিরমিযীঃ ১১৪১, ইবন মাজাহঃ ১৯৬৯, আহমাদঃ ২/৪৭১]

এ সূরার ১২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, কোন এক স্ত্রীর প্রতি যদি তোমার আন্তরিক আকর্ষণ বেশী হয়ে যায়, তবে সেটা তোমার সাধ্যায়ত্ব ব্যাপার নয় বটে, কিন্তু এ ক্ষেত্রেও অন্যজনের প্রতি পরিপূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করা জায়েয হবে না। সূরা আন-নিসার এ আয়াতে ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে না পারার আশংকার ক্ষেত্রে এক বিয়েতেই তৃপ্ত থাকার নির্দেশ এবং পরবর্তী আয়াতে "তোমরা কোন অবস্থাতেই একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা রক্ষা

করতে পারবে না" এ দু'আয়াতের মধ্যে সমন্বয় হচ্ছে, এখানে মানুষের সাধ্যায়ত্ব ব্যাপারে স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আয়াতে যা মানুষের সাধ্যের বাইরে অর্থাৎ আন্তরিক আকর্ষণের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করা হয়েছে। সুতরাং দুটি আয়াতের মর্মে যেমন কোন বৈপরীত্ব নেই, তেমনি এ আয়াতের দ্বারা একাধিক বিবাহের অবৈধতাও প্রমাণিত হয় না। যদি আমরা এ আয়াতের শানে-নুযুলের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট হয়ে যায়। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলছেন, একটি ইয়াতীম মেয়ে এক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে ছিল। লোকটি সে ইয়াতীম মেয়েটির সাথে সম্পদে অংশীদারও ছিল। সে তাকে তার সৌন্দর্য ও সম্পদের জন্য ভালবাসত। কিন্তু সে তাকে ইনসাফপূর্ণ মাহর দিতে রাযী হচ্ছিল না। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করে মাহর দানের ক্ষেত্রে ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থা কায়েম করার নির্দেশ দেন। ইয়াতীম হলেই তার মাহর কম হয়ে যাবে, এমনটি যেন না হয় সেদিকে গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দান করা হয়। [বুখারীঃ ২৪৯৪, ৪৫৭৪, ৫০৯২, মুসলিমঃ ৩০১৮]

ذٰلِكَ اَدۡنٰٓى اَلَّا تَعُوۡلُوۡا - এতে দুটি শব্দ রয়েছে। একটি أَدْنَىএটি دُنُوٌّধাতু থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ হয় নিকটতর। দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছেঃ لَا تَعُولُوا যা عالশব্দ হতে উৎপন্ন, অর্থ ঝুঁকে পড়া। এখানে শব্দটি অসংগতভাবে ঝুঁকে পড়া এবং দাম্পত্য জীবনে নির্যাতনের পথ অবলম্বন করা অর্থে ব্যবহৃত করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, এ আয়াতে তোমাদের যা বলা হল যে, সমতা বজায় রাখতে না পারার আশংকা থাকলে এক স্ত্রী নিয়েই সংসারযাত্রা নির্বাহ কর কিংবা শরীআতসম্মত ক্রীতদাসী নিয়ে সংসার কর; এটা এমন এক পথ যা অবলম্বন করলে তোমরা যুলুম থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘনের সম্ভাবনাও দূর হবে। تَعُولُوا শব্দের দ্বিতীয় আরেকটি অর্থ হতে পারে মিসকীন হয়ে যাওয়া। এর সপক্ষে সূরা আত-তাওবার ২৮ নং আয়াতে عَيْلَةً শব্দটি এসেছে। সেখানে শব্দটির অর্থ করা হয়েছে দারিদ্রতা। ইমাম শাফেয়ী বলেন, এর অর্থ, যাতে তোমাদের পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি না পায়। [ফাতহুল কাদীর]

وَ اٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحۡلَةً ؕ فَاِنۡ طِبۡنَ لَكُمۡ عَنۡ شَىۡءٍ مِّنۡهُ نَفۡسًا فَكُلُوۡهُ هَنِيۡٓـًٔا مَّرِيۡٓـًٔا

৪. আর তোমরা নারীদেরকে তাদের মাহর মনের সন্তোষের সাথে প্রদান কর; অতঃপর সন্তুষ্ট চিত্তে তারা মাহরের কিছু অংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর।

ইসলামপূর্ব যুগে স্ত্রীর প্রাপ্য মাহর তার হাতে পৌছতো না; মেয়ের অভিভাবকগণই তা আদায় করে আত্মসাৎ করত। যা ছিল নিতান্তই একটা নির্যাতনমূলক রেওয়াজ। এ প্রথা উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে কুরআন নির্দেশ দিয়েছেঃ (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ) এতে স্বামীর প্রতি নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, স্ত্রীর মাহর তাকেই পরিশোধ কর; অন্যকে নয়। অন্যদিকে অভিভাবকগণকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, মাহর আদায় হলে যার প্রাপ্য তার হাতেই যেন অর্পণ করে। তাদের অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ যেন তা খরচ না করে।

স্ত্রীর মাহর পরিশোধ করার ক্ষেত্রে নানা রকম তিক্ততার সৃষ্টি হত। প্রথমতঃ মাহর পরিশোধ করতে হলে মনে করা হত যেন জরিমানার অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে। এ অনাচার রোধ করার লক্ষেই نِحْلَةً শব্দটি ব্যবহার করে অত্যন্ত হৃষ্টমনে তা পরিশোধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা, অভিধানে نِحْلَةً বলা হয় সে দানকে, যা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে প্রদান করা হয়। মোটকথা, আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে যে, স্ত্রীদের মাহর অবশ্য পরিশোধ্য একটা ঋণ বিশেষ। এটা পরিশোধ করা অত্যন্ত জরুরী। পরন্তু অন্যান্য ওয়াজিব ঋণ যেমন সন্তুষ্ট চিত্তে পরিশোধ

করা হয়, স্ত্রীর মাহরের ঋণও তেমনি হৃষ্টচিত্তে, উদার মনে পরিশোধ করা কর্তব্য। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আব্দুর রহমান ইবন আউফ কোন এক মহিলাকে এক 'নাওয়া' (পাঁচ দিরহাম পরিমাণ) মাহর দিয়ে বিয়ে করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে খুশী দেখতে পেয়ে কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি এক মহিলাকে এক নাওয়া পরিমাণ মাহর দিয়ে বিয়ে করেছি। [বুখারী ৫১৪৮]

অনেক স্বামীই তার বিবাহিত স্ত্রীকে অসহায় মনে করে নানাভাবে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে মাহর মাফ করিয়ে নিত। এভাবে মাফ করিয়ে নিলে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা মাফ হয় না। অথচ স্বামী মনে করত যে, মৌখিকভাবে যখন স্বীকার করিয়ে নেয়া গেছে, সুতরাং মাহরের ঋণ মাফ হয়ে গেছে। এ ধরণের যুলুম প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, "যদি স্ত্রী নিজের পক্ষ থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মাহরের কোন অংশ ক্ষমা করে দেয়, তবেই তোমরা তা হৃষ্টমনে ভোগ করতে পার।" অর্থ হচ্ছে, চাপ প্রয়োগ কিংবা কোন প্রকার জোর-জবরদস্তি করে ক্ষমা করিয়ে নেয়ার অর্থ কোন অবস্থাতেই ক্ষমা নয়। তবে স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায়, খুশী মনে মাহরের অংশবিশেষ মাফ করে দেয় কিংবা পুরোপুরিভাবে বুঝে নিয়ে কোন অংশ তোমাদের ফিরিয়ে দেয়, তবেই কেবল তোমাদের পক্ষে তা ভোগ করা জায়েয হবে। এ ধরণের বহু নির্যাতনমূলক পন্থা জাহেলিয়াত যুগে প্রচলিত ছিল। কুরআন এসব যুলুমের উচ্ছেদ করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজো মুসলিম সমাজে মাহর সম্পর্কিত এ ধরণের নানা নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা প্রচলিত দেখা যায়। কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী এরূপ নির্যাতনমূলক পথ পরিহার করা অবশ্য কর্তব্য। আয়াতে 'হৃষ্টচিত্তে' প্রদানের শর্ত আরোপ করার পেছনে গভীর তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। কেননা, মাহর স্ত্রীর অধিকার এবং তার নিজস্ব সম্পদ হৃষ্টচিত্তে যদি সে তা কাউকে না দেয় বা দাবী ত্যাগ না করে, তবে স্বামী বা অভিভাবকের পক্ষে সে সম্পদ কোন অবস্থাতেই হালাল হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে শরীয়তের মূলনীতিরূপে এরশাদ করেছেনঃ "কারো পক্ষে অন্যের সম্পদ তার আন্তরিক তুষ্টি ব্যতীত গ্রহণ করা হালাল হবে না।" [মুসনাদে আহমাদঃ ৩/৪২৩] এ হাদীসটি এমন একটা মূলনীতির নির্দেশ দেয়, যা সর্বপ্রকার প্রাপ্য ও লেন-দেনের ব্যাপারে হালাল এবং হারামের সীমারেখা নির্দেশ করে। [তাফসীরে জাকারিয়া]

وَ لَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِیْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِیٰمًا وَّ ارْزُقُوْهُمْ فِیْهَا وَ اكْسُوْهُمْ وَ قُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

৫. আর তোমরা অল্প বুদ্ধিমানদেরকে তাদের ধন-সম্পদ অর্পণ করে না, যা দ্বারা আল্লাহ তোমাদের জীবন চালানোর ব্যবস্থা করেছেন এবং তা থেকে তাদের আহার-বিহার ও ভরণপোষনের ব্যবস্থা কর। আর তোমরা তাদের সাথে সদালাপ কর।

এ আয়াতে ধন-সম্পদের গুরুত্ব এবং মানুষের জীবন ধারণের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং সম্পদের হেফাযতের ক্ষেত্রে একটা সাধারণ ত্রুটির সংশোধন নির্দেশ করা হয়েছে। তা হচ্ছে, অনেকেই স্নেহান্ধ হয়ে অল্পবয়স্ক, অনভিজ্ঞ ছেলে-মেয়ে অথবা স্ত্রীলোকদের হাতে ধন-সম্পদের দায়-দায়িত্ব তুলে দেয়। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সম্পদের অপচয় এবং যা দারিদ্র ঘনিয়ে আসার আকারে দেখা দেয়। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন যে, কুরআনুল কারীমের এ আয়াতে নির্দেশ করা হচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান-সন্ততি কিংবা অনভিজ্ঞ স্ত্রীলোকদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থেকো না, বরং আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু তোমাকে অভিভাবক এবং দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছেন, সেজন্য তুমি সম্পদ তোমার নিজের হাতে রেখে তাদের খাওয়া-পরার দায়-দায়িত্ব পালন করতে থাক। যদি তারা অর্থ-

সম্পদের দায়িত্ব নিজ হাতে নিয়ে নেয়ার আব্দার করে, তবে তাদেরকে ভালভাবে বুঝিয়ে দাও যে, এসব তোমাদের জন্যই সংরক্ষণ করা হচ্ছে, যাতে তাদের মনোকষ্টের কারণ না হয়, আবার সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও দেখা না দেয়। [তাবারী]

উপরোক্ত ব্যাখ্যা মতে, এমন সবার হাতেই সম্পদ অর্পন করা যাবে না যাদের হাতে পড়ে ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে। এতে ইয়াতীম শিশু বা নিজের সন্তানের কোন পার্থক্য নেই। আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহুও এ আয়াতের এরূপ তাফসীরই বর্ণনা করেছেন। [তাবারী] মোটকথা, মালের হেফাজত অত্যন্ত জরুরী এবং অপচয় করা গোনাহের কাজ। নিজের সম্পদের হেফাজত করতে গিয়ে যদি কেউ নিহত হয়, তবে সে শহীদের মর্যাদা পাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ নিজের মালের হেফাজত করতে গিয়ে যদি কেউ নিহত হয়, তবে সে শহীদ'। [বুখারীঃ ২৪৮০, মুসলিমঃ ১৪১] অর্থাৎ সওয়াবের দিক দিয়ে শহীদের মর্যাদা পাবে।

وَ ابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰۤى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْۤا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَ لَا تَاْكُلُوْهَاۤ اِسْرَافًا وَّ بِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ؕ وَ مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَ مَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا

৬. আর ইয়াতিমদেরকে যাচাই করবে যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের যোগ্য হয়; অতঃপর তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখতে পেলে তাদের সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। তারা বড় হয়ে যাবে বলে অপচয় করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেল না। যে অভাবমুক্ত সে যেন নিবৃত্ত থাকে এবং যে বিত্তহীন সে যেন সংযত পরিমাণে ভোগ করে অতঃপর তোমরা যখন তাদেরকে সম্পদ ফিরিয়ে দিবে তখন সাক্ষী রেখো। আর হিসেব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট।

আয়াতে শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষা ও যোগ্যতা যাচাই করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ বালেগ হওয়ার আগেই ছোট ছোট দায়িত্ব দিয়ে তাদের যোগ্যতা যাচাই করতে থাক, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহের পর্যায়ে পৌছে অর্থাৎ বালেগ হয়। মোটকথা, বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে তাদের যোগ্যতা যাচাই করতে থাক এবং যখন দেখ যে, তারা দায়িত্ব বহন করার যোগ্য হয়ে উঠেছে, তখন তাদের সম্পদ তাদের হাতে বুঝিয়ে দাও। সারকথা হচ্ছে, শিশুরা বিশেষ প্রকৃতি ও জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশের মাপকাঠিতে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। (এক) বলেগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়, (দুই) বালেগ হওয়ার পরবর্তী সময়, (তিন) বালেগ হওয়ার আগেই জ্ঞান-বুদ্ধির যথেষ্ট বিকাশ। ইয়াতীম শিশুর অভিভাবকগণকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন তারা শিশুর লেখাপড়া ও জীবন গঠনের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অতঃপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বুদ্ধির বিকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যে ছোট ছোট কাজ কারবার ও লেন-দেনের দায়িত্ব অর্পণ করে তাদের পরীক্ষা করতে থাকেন।

কুরআনের এ নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে যে, ইয়াতীম শিশুর মধ্যে যে পর্যন্ত বুদ্ধি-বিবেচনার বিকাশ লক্ষ্য না কর, সে পর্যন্ত তাদের বিষয়-সম্পত্তি তাদের হাতে তুলে দিও না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ বুদ্ধি-বিবেচনা'র সময়সীমা কি? কুরআনের অন্য কোন আয়াতেও এর কোন শেষ সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। এ জন্য কোন কোন ফিকহবিদ মত প্রকাশ করেছেন যে, যদি কোন ইয়াতীমের মধ্যে যথেষ্ট বয়স হওয়ার পরও বুদ্ধি-বিবেচনার লক্ষণাদি দেখা না

যায়, তবে অভিভাবক তার হাতে বিষয়সম্পত্তি তুলে দিতে পারবে না। সমগ্র জীবন এ সম্পত্তি তার তত্ত্বাবধানে রাখতে হলেও না।

শিশু যখন বালেগ এবং বিয়ের যোগ্য হয়ে যায়, তখন তার অভিজ্ঞতা ও বিষয়বুদ্ধি পরিমাপ করতে হবে। যদি দেখা যায়, সে তার ভালমন্দ বুঝবার মত যথেষ্ট অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে, তখন তার বিষয়-সম্পত্তি তার হাতে তুলে দাও।

আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমার কোন সম্পদ নেই। আমার তত্ত্বাবধানে ইয়াতীম আছে, তার সম্পদ রয়েছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ তোমার ইয়াতীমের মাল থেকে তুমি খেতে পার, অপব্যয় ও অপচয় না করে, তার সম্পদকে তোমার সাথে না মিশিয়ে এবং তার সম্পদের বিনিময়ে তোমার সম্পদের হেফাজত না করে। [মুসনাদে আহমাদঃ ২/১৮৬, ২১৫, ২১৬, আবু দাউদঃ ২৮৭২] আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, এ আয়াত ইয়াতীমের সম্পদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, যদি কেউ ফকীর হয়, সে ইয়াতীমের সঠিক তত্ত্বাবধানের কারণে তা থেকে খেতে পারবে। [বুখারী: ৪৫৭৫; মুসলিম: ৩০১৯]

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ ۪ وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ؕ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا

৭. পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, সেটা অল্পই হোক বা বেশীই হোক, এক নির্ধারিত অংশ।

ইসলাম আসার পূর্বে একটি যুলুম এও ছিল যে, মহিলা ও ছোট শিশুদেরকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করা হত। বড় ছেলে যে যুদ্ধের উপযুক্ত হত, কেবল সেই সমস্ত মালের অধিকারী হত। এই আয়াতে মহান আল্লাহ বলে দিলেন যে, পুরুষদের মত মহিলা ও ছোট ছেলে-মেয়েরাও তাদের পিতা-মাতার এবং আত্মীয়দের মালের অংশীদার হবে; তাদেরকে বঞ্চিত করা যাবে না। তবে এটা পৃথক ব্যাপার যে, মেয়ের অংশ ছেলের অর্ধেক। (যেমন, তিনটি আয়াতের পর উল্লেখ করা হয়েছে।) এতে না মহিলার উপর যুলুম করা হয়েছে, আর না তার মর্যাদা খাটো করা হয়েছে, বরং ইসলামের এই উত্তরাধিকার নিয়ম ন্যায় ও সুবিচারের দাবীসমূহের সাথে একেবারে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, মহিলাদেরকে ইসলাম জীবিকা উপার্জনের দায়িত্ব থেকে মুক্ত রেখেছে এবং পুরুষদের উপরেই চাপিয়েছে এই দায়িত্ব। এ ছাড়াও মোহর বাবদ কিছু মাল মহিলার কাছে আসে। একজন পুরুষই এই মাল তাকে দেয়। এই দিক দিয়ে মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের উপর অনেক বেশী আর্থিক দায়িত্ব আরোপিত হয়। সুতরাং মহিলার অংশ যদি অর্ধেকের পরিবর্তে পুরুষের সমান হত, তাহলে পুরুষের উপর যুলুম করা হত। বলাই বাহুল্য যে, আল্লাহ তাআলা কারো উপর যুলুম করেননি। কেননা, তিনি সুবিচারক এবং সুকৌশলী। [তাফসীরে আহসানুল বায়ান]

وَ اِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَ قُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

৮. আর সম্পত্তি বন্টনকালে আত্মীয়, ইয়াতীম এবং অভাবগ্রস্ত লোক উপস্থিত থাকলে তাদেরকে তা থেকে কিছু দিবে এবং তাদের সাথে সদালাপ করবে।

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এ আয়াত মুহকাম, এ আয়াত রহিত হয়নি। অর্থাৎ এর উপর আমল করতে হবে। [বুখারী ৪৫৭৬] অন্য বর্ণনায় ইবন আব্বাস বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনগণকে তাদের মীরাস বন্টনের সময় আত্মীয়তার সম্পর্কে প্রতিষ্ঠা, ইয়াতীমদের তত্ত্বাবধান এবং মিসকীনদের জন্য যদি মৃত ব্যক্তির কোন অসীয়ত থেকে থাকে, তবে সে অসীয়ত থেকে প্রদান করতে হবে। আর যদি অসীয়ত না থাকে, তবে তাদেরকে মীরাস থেকে কিছু পৌছাতে হবে। [তাবারী]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবদুর রহমান ইবন আবী বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মীরাস বন্টনের সময় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তখনও জীবিত- আব্দুর রহমানের সন্তান আবদুল্লাহ ঘরে ইয়াতীম, মিসকীন, আত্মীয়স্বজন সবাইকে তার পিতার মীরাস থেকে কিছু কিছু প্রদান করেন, এ হিসেবে যে, এখানে (الْقِسْمَةَ) শব্দের অর্থ, বন্টন। তারপর সেটা ইবন আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন, ঠিক করে নি। কারণ এটা অসীয়ত করার প্রতি নির্দেশ। এ আয়াতটিতে অসীয়তের কথাই বলা হয়েছে। যখন মাইয়্যেত তার সম্পদের ব্যাপারে অসীয়ত করতে চাইবে সে যেন নিঃস্ব, ইয়াতীম স্বজনদের না ভুলে সে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ] সে হিসেবে এটি মৃত্যুর আগেই সম্পদের মালিকের করণীয় নির্দেশ করছে। [তাফসীরে জাকারিয়া]

وَ لْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۪ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَ لْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

৯. আর তারা যেন ভয় করে যে, অসহায় সন্তান পিছনে ছেড়ে গেলে তারাও তাদের সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হত। কাজেই তারা যেন আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সঙ্গত কথা বলে।

কোন কোন মুফাসসিরের নিকট এই আয়াতে 'অসী'দেরকে (যাদেরকে অসিয়ত করা হয় তাদেরকে) সম্বোধন করা হয়েছে। তাদেরকে নসীহত করা হচ্ছে যে, তাদের তত্ত্বাবধানে যে ইয়াতীমরা রয়েছে, তাদের সাথে যেন তারা ঐরূপ সুন্দর ব্যবহার করে, যেরূপ সে পছন্দ করে তার মৃত্যুর পর তার সন্তানদের সাথে করা হোক। আবার কোন কোন মুফাসসের বলেছেন, এতে সাধারণ লোকদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তারা যেন ইয়াতীম এবং অন্য ছোট ছোট শিশুদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে; চাহে তারা তার তত্ত্বাবধানে হোক বা না হোক। কেউ বলেছেন, এখানে সেই ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে, যে মৃত্যুর নিকটবর্তী ব্যক্তির পাশে বসে আছে। তার দায়িত্ব হল মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে উত্তম কথা শিক্ষা দেওয়া, যাতে সে আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের অধিকারের ব্যাপারে যেন কোন অবহেলা না করে এবং অসিয়ত করার সময় যেন এই উভয় অধিকারের খেয়াল রাখে। সে যদি বড় বিত্তশালী হয়, তাহলে তার অভাবী ও সাহায্যের প্রত্যাশী নিকটাত্মীয়ের জন্য নিজের মালের এক তৃতীয়াংশের অসিয়ত যেন অবশ্যই করে অথবা কোন দ্বীনী কাজে বা দ্বীনী প্রতিষ্ঠানে ব্যয় করার জন্য যেন অসিয়ত করে। কারণ, এই মালই হবে তার আখেরাতের সম্বল। আর সে যদি বিত্তশালী না হয়, তাহলে তার মালের এক তৃতীয়াংশেও অসিয়ত করতে তাকে বাধা দিতে হবে। যাতে তার পরিবারের লোকরা যেন নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত না হয়ে পড়ে। অনুরূপ কেউ যদি তার কোন উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করতে চায়, তাহলে তাকে এ কাজে বাধা দিতে হবে এবং তার উত্তরাধিকারীদের জন্য সেটাই করা পছন্দ করবে, যা করা সে পছন্দ করে নিজের সন্তানাদির উপর অভাব-অনটনের আশঙ্কা বোধ করলে। এই ব্যাখ্যায় উল্লিখিত সকলেই আয়াতের সম্বোধনের আওতায় এসে যায়। (তাফসীর ক্বুরত্বী-ফাতহুল ক্বাদীর)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ؕ وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا

১০. নিশ্চয় যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তো তাদের পেটে আগুনই খাচ্ছে; তারা অচিরেই জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ পরিহার কর। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কি? রাসূল বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, জাদু, অন্যায়ভাবে কোন প্রাণ সংহার করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের সম্পদ গ্রাস করা, যুদ্ধের মাঠ থেকে পলায়ন করা এবং মুমিনা পবিত্রা নারীকে মিথ্যা অপবাদ দেয়া। [বুখারী: ২৭৬৬] সুতরাং ইয়াতিমের সম্পদ গ্রাস করার শাস্তি কুরআন ও হাদীস উভয়ের দ্বারাই প্রমাণিত।

ফুটনোট

⊡ পৃথিবীর সকল মানুষ একজন নর ও নারী থেকে সৃষ্ট। 'একটি ব্যক্তি/প্রাণ' বলতে মানবকুলের পিতা আদম (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। আদম (আঃ) থেকেই তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

⊡ পবিত্র কুরআনের আত্মীয়তার সম্পর্ক বুঝানোর জন্য 'আরহাম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বুনিয়াদকে ইসলামী পরিভাষায় 'সেলায়ে-রাহমী' বলা হয়। আর এতে কোন রকম বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হলে তাকে বলা হয় 'কেত্বয়ে-রাহমী'। আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখা ওয়াজিব।

⊡ ইয়াতিমের সম্পদ গ্রাস করাকে বড় গুনাহ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তো তাদের পেটে আগুনই খাচ্ছে, তারা অচিরেই জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে।

⊡ একত্রে একজন পুরুষ চারজন মহিলাকে বিবাহ করতে পারে তবে শর্ত হলো সকলের মাঝে সমতা বহাল রাখার যোগ্য হতে হবে।

⊡ মাহর স্ত্রীর হক, তাই তাকে প্রদান করা আবশ্যক।

⊡ ইসলামের কোন বিধানকে অপছন্দ করা কুফরী কাজ, বরং আনুগত্যের সাথে সকল বিধানকে মেনে নিতে হবে।

⊡ ইসলাম নারীর অর্থনৈতিক অধিকার দিয়েছে, তাদের অর্থে স্বামীরও হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই।

⊡ অনেকেই স্নেহান্ধ হয়ে অল্পবয়স্ক, অনভিজ্ঞ ছেলে-মেয়ে অথবা স্ত্রীলোকদের হাতে ধন-সম্পদের দায়-দায়িত্ব তুলে দেয়। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সম্পদের অপচয় এবং যা দারিদ্র ঘনিয়ে আসার আকারে দেখা দেয়। এমন সবার হাতেই সম্পদ অর্পন করা যাবে না যাদের হাতে পড়ে ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে। এতে ইয়াতীম শিশু বা নিজের সন্তানের কোন পার্থক্য নেই।

⊡ ইসলাম সর্বপ্রথম সুষ্ঠু উত্তরাধিকার ব্যবস্থা চালু করেছে।

⊡ উত্তরাধিকার বণ্টনের সময় যে সকল আত্মীয় অংশ পায় না, তাদের কিছু দেয়া মুস্তাহাব।

⊡ মুমূর্ষু ব্যক্তিকে সৎ দিক-নির্দেশনা দেয়া উচিত।